মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৩য় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০২২

২০ জুন ২০২২ : বিশ্ব শরণার্থী দিবস
‘আঁরা রোহিঙ্গা’ আলোকচিত্র প্রদর্শনী

বিশ্ব শরণার্থী দিবস উপলক্ষ্যে রোহিঙ্গাটোগ্রাফার ম্যাগাজিন, জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশস্থ স্প্যানিশ দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতার জন্য স্প্যানিশ সংস্থা (AECID) যৌথভাবে ‘আঁরা রোহিঙ্গা (আমরা রোহিঙ্গা)’ শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রদর্শনীতে দশজন রোহিঙ্গা শরণার্থী আলোকচিত্রীর তোলা ৫০টি ছবির মাধ্যমে শরণার্থীদের জীবন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রূপায়িত হয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী শিবিরে বসবাসকারী লোকদের জীবনযাত্রা কেমন সে সম্পর্কে অন্তরঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে এ প্রদর্শনী। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অস্থায়ী প্রদর্শনী হলে ২০ জুন ২০২২ এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়।

বাংলাদেশে ইউএনএইচসিআর-এর ডেপুটি রিপ্রেজেন্টেটিভ মিস সু জিন রি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব হাসান সারোয়ার, বাংলাদেশস্থ কানাডা দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত লিলি নিকোলাস, বাংলাদেশে কর্মরত ইউএনএইচসিআর এর কর্মকর্তা, বিভিন্ন এনজিও, মিশন এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রতিনিধিবৃন্দ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মীবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথি এবং দশনার্থীরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভ এবং ডিসপ্লে বিভাগের কিউরেটর আমেনা খাতুন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান। বক্তব্যের শুরুতে তিনি প্রদর্শনীর একটি ওভারভিউ প্রদান করেন এবং প্রদর্শনীর সহ-কিউরেটর ডেভিড পালাজন এবং রোহিঙ্গাটোগ্রাফার ম্যাগাজিনকে ধন্যবাদ জানান।

প্রদর্শনীর দ্বিতীয় অংশ ব্যাখা করে আমেনা খাতুন বলেন *“Remembering 1971 Bangladesh Refugee Camps”* তুলে ধরে অতীতে গণহত্যার শিকার একটি জাতি কীভাবে চলমান গণহত্যার শিকার আরেকটি জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়েছে। এটাই মানবতার শক্তি।

বাংলাদেশে ইউএনএইচসিআরের ডেপুটি রিপ্রেজেন্টেটিভ মিস সো জিন রি প্রতি বছর ২০ জুন বিশ্ব শরণার্থী দিবস পালনের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতার ওপর জোর দিয়ে বলেন, ‘*সহানুভূতি ও বোঝাপড়া তৈরি করতে এবং শরণার্থী জীবনের ভারসাম্যের স্বীকৃতি দিতে আমরা প্রতি বছর এই দিনটি পালন করি। প্রত্যেকেরই নিরাপদে থাকার অধিকার রয়েছে, তারা যেই হোক না কেন, যেখান থেকে আসুক না কেন এবং যেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হউক না কেন*’।

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশ্ব শরণার্থী দিবসের আলোচনা
মুক্তিযুদ্ধের চিকিৎসা ইতিহাস

গত ২০ জুন ২০২২ বিশ্ব শরণার্থী দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে আয়োজিত হয় এক বিশেষ আলোচনা, স্মারকগ্রহণ ও প্রামাণ্য অডিও-ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনা অনুষ্ঠান। মুখ্য বক্তা হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন– একাত্তরের চিকিৎসা যুদ্ধ বিষয়ক গবেষক ডা. খায়রুল ইসলাম। এসময় শরণার্থী ক্যাম্পে ব্যবহৃত একটি কলেরা স্যালাইনের কাচের বোতল স্মারক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদঘরের আর্কাইভে প্রদান করেন সাংবাদিক শিশির মোড়ল। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন– মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী এবং ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের।

অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তেব্যে ডা. সারওয়ার আলী বলেন– ১৯৭১ সালে আমি নিজে শরণার্থী ছিলাম। মার্চ মাসের শেষের দিকে যখন দেশের সর্বত্র গণহত্যা শুরু হয় তখন মানুষজন শরণার্থী হতে বাধ্য হয়েছে। এব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও সাধারণ জনগণ যে সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আজও আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। হিসেব মতে প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। এছাড়াও এক বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী শরণার্থী শিবিরের বাইরে ছিলেন। যে বিষয়টা কোন হিসেবের মধ্যে নেই সেটা হলো ইন্টারনাল ডিসপ্লেসম্যান্ট। তরুণ প্রজন্মের প্রতি আমি বলবো– এসব

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR Representation in Bangladesh

09 July 2022

Subject: Letter of gratitude to the Board of Trustees of the Liberation War Museum

Dear Mr. Hoque,

I wish to convey my sincere gratitude to the Board of Trustees of the Liberation War Museum, and to you personally, for the kind support extended to make possible the "We are Rohingya" photograph exhibition which is being shown at the Museum from 20 June to 7 July.

Although I was unfortunately out of the country and hence not able to attend the opening of the exhibition on World Refugee Day on 20 June, I closely followed the event from a distance and learnt that the launch was a great success, with active participation of Museum representatives, Government, civil society, humanitarian actors and diplomatic community. I also know that the Rohingya artists who created the photographs are proud of and grateful for the exhibition of their work.

I am grateful for your thoughtful engagement and the Museum's skillful curation of the exhibition, as it draws a parallel between Rohingya refugees generously hosted in Bangladesh and some ten million Bangladeshi nationals who were forced to flee and lived as refugees in India in 1971. The positive reactions and comments we have received since from our counterparts who have visited the exhibition is testament to the quality of, and stories behind, the photographs which showcase what is both artwork and an opportunity for dialogue. Art does indeed bring us together.

Please allow me to reiterate my sincere appreciation for your commitment and support in presenting and visualizing the plight of refugees generally and the Rohingya refugee cause in Bangladesh in particular. Please also convey my words of appreciation to the Members of the Board and your collaborators who were instrumental in making the launch of this exhibition a success.

I look forward to continuing our close and positive collaboration with you and the Liberation War Museum.

Johannes van der Klaauw
Representative
UNHCR in Bangladesh

Mr. Mofidul Hoque
Board of Trustees
Liberation War Museum
Dhaka, Bangladesh

ইউএনএইচসিআর বাংলাদেশ প্রতিনিধি Mr. Johannes van der Klaauw-এর প্রদর্শনী পরিদর্শন

ইউএনএইচসিআর এর বাংলাদেশস্থ প্রতিনিধি Mr. Johannes van der Klaauw গত ৭ জুলাই ‘আঁরা রোহিঙ্গা’ (আমরা রোহিঙ্গা) শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক তাকে স্বাগত জানান এবং প্রদর্শনী ঘুরিয়ে দেখান।

পরিদর্শন শেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের, ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী এবং ট্রাস্টি মফিদুল হক-সহ এক সংক্ষিপ্ত সভায় মিলিত হন। এসময় প্রদর্শনীর কিউরেশনসহ সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টিদের তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ধন্যবাদ পত্রে তিনি বলেন, ‘*দুর্ভাগ্যবশত দেশের বাইরে থাকায় আমি ২০ জুন বিশ্ব শরণার্থী দিবসে প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারিনি। তবে আমি জেনেছি আন্তর্জাতিক সংস্থা, সরকারের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, মানবাধিকার কর্মী এবং কূটনীতিকদের উপস্থিতিতে একটি আড়ম্বরপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে যা রোহিঙ্গা শিল্পীদের জন্য গর্বের*’।

তিনি জাদুঘরের দক্ষতাপূর্ণ কিউরেশনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যা এই প্রদর্শনীতে রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং ১৯৭১ সালে ভারতে শরণার্থী হিসেবে বসবাসকারী প্রায় দশ মিলিয়ন বাংলাদেশী নাগরিকদের একই সমান্তরালে দাঁড় করিয়েছে।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দুর্দশা উপস্থাপন এবং সমর্থনের জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা পুনর্ব্যক্ত করেন। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এবং যারা এই প্রদর্শনীটি সফল করার জন্য ভূমিকা রেখেছেন তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ইতিবাচক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

আর্কাইভ অ্যান্ড ডিসপ্লে বিভাগ

জামালপুর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মতবিনিময়

গত ৫ই জুলাই, ২০২২ মঙ্গলবার জামালপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে ''শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ'' প্রকল্পের আওতায় নির্মিত **জামালপুর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর**- এর গ্যালারিসজ্জা কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় অংশীজন জামালপুর জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মির্জা আজম এমপি এ সভার আয়োজন করেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আসাদুজ্জামান নূর এবং সভাপতিত্ব করেন জামালপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ফারুক আহাম্মেদ চৌধুরী। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লেখক ও গবেষক বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবীব, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, বীর প্রতীক জহুরুল হক মুন্সী, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল ইসলাম আকন্দ, জামালপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোকলেছুর রহমান, জামালপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব মাহফুজ আলম, জামালপুরের পৌর মেয়র জনাব ছানোয়ার হোসেন ছানু, জামালপুর জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, জামালপুর আওয়ামীলীগের সভাপতি জনাব মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ, মুক্তিসংগ্রাম জাদুঘরের পরিচালক উৎপল কান্তি ধর, মুক্তিসংগ্রাম জাদুঘরের ট্রাস্টি হিল্লোল সরকারসহ জামালপুরের স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, বিশিষ্ট গবেষক ও শিক্ষাবিদগণ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৬ সদস্যের প্রতিনিধি দল এ মতবিনিময় সভায় অংশ নেয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা সুজাত আলী ফকিরের সঞ্চালনায় ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে পাঠ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচয় পর্বের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। এরপর স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মির্জা আজম এমপি। তিনি আগত সকল মুক্তিযোদ্ধা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে স্বাগত জানিয়ে শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প ও জাদুঘরের আঞ্চলিক গুরুত্ব তুলে ধরেন। ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হক জামালপুর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রদর্শনী সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভ ও প্রদর্শনী দলকে থ্রিডি উপস্থাপনের আহ্বান জানান। **জামালপুর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর**- এর পরিকল্পনা ও গ্যালারিসজ্জা কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দিতে থ্রিডি উপস্থাপন করেন আমেনা খাতুন, কিউরেটর, আর্কাইভ অ্যান্ড ডিসপ্লে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। থ্রিডি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য এবং মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে এ কাজে এগিয়ে আসবেন তার ব্যাখ্যা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবীব। তার বক্তব্যে জামালপুরের গণহত্যা, নির্যাতনের বিষয়াদি উঠে আসে এবং তিনি সকল মুক্তিযোদ্ধাকে জাদুঘরে স্মারক প্রদানের আহ্বান জানান।

মির্জা আজম এমপি তার বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধে জামালপুর জেলার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও বর্তমান জামালপুরের উন্নয়নের বিষয়সমূহ উল্লেখ করে জামালপুর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব তুলে ধরেন। জাদুঘর নির্মাণে ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা স্মারক ও তথ্য প্রদান করার আহ্বান জানিয়ে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণ কামনা করেন। পাশাপাশি স্মারক ও তথ্য সংগ্রহ এবং যাচাই-বাছাই কার্যক্রমের জন্য বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবীবের নেতৃত্বে কমিটি গঠনের আহ্বান জানান। এরপর জাদুঘরের গ্যালারিসজ্জা সম্পর্কে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হক। তিনি বলেন, জাদুঘরে ইতিহাস লিখে দিলে হবে না। স্মারক উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে ইতিহাস তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর জাদুঘর নির্মাণ প্রসঙ্গে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা নানা মত প্রদান করেন। মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন দেওয়ানগঞ্জের সাবেক কমান্ডার খায়রুল, ইসলামপুরের কমান্ডার মানিকুর ইসলাম, জেলা কমান্ডার হারুনুর রশিদ, মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম, মুক্তিযোদ্ধা কিসমত পাশা, মুক্তিযোদ্ধা হামিদ, মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান, সদর থানার কমান্ডার হায়দার আলী, সদর থানার কমান্ডার মুখলেসুর রহমান, কোম্পানি কমান্ডার গোলাম মোহাম্মদ, বীরপ্রতীক জহুরুল হক মুন্সি প্রমুখ। তাঁদের মতামত ও পরামর্শের মধ্য দিয়ে জাদুঘর সজ্জা ও গবেষণার নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়। জাদুঘর নির্মাণে সকল উপজেলাকে আলাদাভাবে তুলে ধরা, উপজেলাভিত্তিক যুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা, রাজাকার ও শহিদের তালিকা তৈরি, আশেক মাহমুদ কলেজের নির্যাতন কেন্দ্রকে সংরক্ষণ করা, চৈতন্য নার্সারির অবশিষ্ট গাছগুলি **৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন**

৩৯তম নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলন

নতুন ভাবনা নতুন প্রযুক্তি নতুন উদ্যোগ

'নতুন প্রযুক্তি, নতুন সম্ভাবনা'- এই প্রতিপাদ্য ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের নিয়ে দিনব্যাপী ৩৯তম নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হলো ১৮ জুন ২০২২। তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর বর্তমান বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কীভাবে জনগণের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকবে এবং শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল পাঠ উপকরণসহ অনলাইন কার্যক্রম পরিচালনা করবে সেসব বিষয়ে নমুনা উপস্থাপনসহ বিস্তারিত আলোচনা হয় সম্মিলনে। মূলত ঢাকার আইসিটি শিক্ষকদের অংশগ্রহণ থাকলেও নীলফামারী, সাতক্ষীরা, ফরিদপুর এবং ঢাকার নিকটবর্তী টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও গাজীপুরের প্রতিনিধিসহ ৪৪ জন আইসিটি শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত বক্তব্যে জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, শিক্ষকরা জাদুঘরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ শিক্ষকদের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, জাদুঘরের একার পক্ষে সব কিছু করা সম্ভব নয়, নেটওয়ার্ক শিক্ষকরা সাথে থাকলে অনেক কিছু করা সম্ভব হবে।

জাদুঘরের ট্রাস্টি এবং শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং মানবাধিকার ও শান্তি-সম্প্রীতির ভাবধারায় উদ্বুদ্ধকরণ প্রকল্পের পরিচালক মফিদুল হক নতুন প্রযুক্তি, নতুন সম্ভাবনার আলোকে সম্মিলনের উদ্দেশ্য এবং কার্যসূচি ব্যাখ্যা করে বলেন, এটা ৩৯তম শিক্ষক সম্মিলন হলেও এরকম সম্মিলন আগে জাদুঘর করেনি। নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের সঙ্গে জাদুঘরের সম্পর্ক এর বড় শক্তি। কোনো তথ্য বা প্রয়োজনে যখনই শিক্ষকদের কাছে যাই আন্তরিক সাড়া সবসময়ই পাই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরাও একটা সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে আজ বিশেষভাবে, একটা বিশেষ চিন্তা থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আইসিটি শিক্ষকদের। তিনি বলেন জাদুঘর ইতিহাসকে ধারণ করে তথ্য এবং উপকরণের উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে। আজকে এ-নিয়ে নতুনভাবে চিন্তার সুযোগ এসেছে। এজন্যই বলা হচ্ছে 'নতুন প্রযুক্তি, নতুন ভাবনা।' যে কাজগুলো জাদুঘর করছে তার আরেকটা পর্ব শুরু করা যায়।

এরপর মুক্তিযুদ্ধের ভার্চুয়াল গ্যালারির কিছু অংশ প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনী শেষে আলোচনাপর্বে শিক্ষক প্রতিনিধিরা বলেন, ভার্চুয়াল জাদুঘর গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, শিক্ষার্থীরা স্কুলে বসে জাদুঘরের গ্যালারি দেখার সুযোগ পাবে। পাশাপাশি সারাদেশের ও বাইরের মানুষ এটা দেখার সুযোগ পাবে।

এরপর দ্বিতীয় কার্যঅধিবেশনের শুরুতে **৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন**

জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ-এর পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

২১ জুন ২০২২ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ ১৫ বছরে পদার্পন করেছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন এর নকশায় ও শহীদ পরিবারে আন্তরিক সহযোগিতায় ২০০৭ সালে জল্লাদখানা স্মৃতিপীঠ নির্মিত হয়। যার মধ্যভাগে রয়েছে বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী রফিকুন নবী ও মনিরুজ্জামান নির্মিত ম্যুরাল 'জীবন অবিনশ্বর'।

২০০৭ সালে শহীদ পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হলেও বর্তমানে জল্লাদখানায় ৭০ জন শহীদদের তালিকা ও ১ হাজারের অধিক শহীদ স্বজনের সাক্ষাৎকার সংরক্ষিত রয়েছে।

গত এক বছরে ২২,৩৭৫ জন দর্শনার্থী জল্লাদখানা পরিদর্শন করেছেন। এর মধ্যে বিগত পনেরো বছরে জল্লাদখানা পরিদর্শনকারী দেশী-বিদেশী মোট দর্শনার্থী ৮,৪৪,৪৩১ জন।

জল্লাদখানা উদ্বোধনের পর থেকে সপ্তাহের প্রতি শনিবার স্থানীয় স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে শহীদ পরিবারের স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান

আয়োজন করা হয়। নতুন প্রজন্মকে জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে একাত্তরে জল্লাদখানাসহ সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য বধ্যভূমির নির্মম গণহত্যার ইতিহাসকে তুলে ধরা এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। ২০০৭ সাল হতে বিগত ১৫ বছরে এই কর্মসূচিতে ২৬৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২১,৮৪৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে।

জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠের পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি। সূচনা বক্তব্যের পর জল্লাদখানার বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। বক্তব্য প্রদান করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী রফিকুন নবী। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কাজী জহিরুল ইসলাম মানিক শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করেন শহীদ খন্দকার আবু তালেব-এর পুত্র খন্দকার আবুল আহসান, শহীদ গোলাম কিবরিয়া চৌধুরীর কন্যা নাসরিন আক্তার চৌধুরী এবং শহীদ আক্রব আলীর পুত্র মো: ফরিদুজ্জামান। উপস্থিত ছিলেন একাত্তরের পদযাত্রী দলের ডেপুটি লিডার কামরুল আমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়ারেন্ট অফিসার (অবসরপ্রাপ্ত) মোকলেসুর রহমান ও শহীদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

শহীদ সন্তানদের স্মৃতিচারণের পর শহীদ পরিবারের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্ম নিয়ে গঠিত 'বধ্যভূমির সন্তানদল'-এর বিশেষ পরিবেশনা গীতি-নৃত্য-কাব্য-আলেখ্যানুষ্ঠান 'সত্য-শান্তি-সাম্যের জয়' পরিবেশিত হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আনন্দলোক সাংস্কৃতিক একাডেমির ছোট্ট নৃত্যশিল্পী বন্ধুরা পল্লীগীতির সাথে মনোমুগ্ধকর নৃত্য পবিবেশন করে। বুলবুল ললিতকলা একাডেমি দেশমাতৃকার গান ও নৃত্য পরিবেশন করে। মিথস্ক্রিয়া আবৃত্তি পরিসর আবৃত্তি প্রযোজনা 'লোকসাধারনের কথা: শিকড়ের সন্ধানে' মঞ্চস্থ করে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান পরিবেশন করে সংগীত সমাজ কল্যাণপুরের প্রবীণ শিল্পীবৃন্দ। সর্বশেষ যুব বান্ধব কেন্দ্রের নৃত্যশিল্পীদের পরিবেশনায় সমাপ্ত হয় জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠের পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজন।

প্রমিলা বিশ্বাস

শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা ২০২২
সম্মিলনী সভা ও সনদপত্র প্রদান

গত ১৭ জুন ২০২২ অনুষ্ঠিত হলো শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা ২০২২-এর সম্মিলনি সভা ও সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠান। পদযাত্রী বন্ধু এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের এই অনুষ্ঠানটি এখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও অভিযাত্রী ঘরানার সকল বন্ধুদের একটি মিলনের দিন, আনন্দের দিন। পদযাত্রী বন্ধুদের অনুভূতি শোনা ও সনদপত্র প্রদান ছাড়াও বিভিন্ন বন্ধুদের পরিবেশনা মুগ্ধ করেছে সকলকে। এবছর ঢাকার পাশাপাশি, পাবনার ভাঙ্গুড়া, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নাসির নগর এবং লালমনিরহাটের হাতিবান্ধায় পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। তার স্মৃতিচারণ মূলক বক্তব্য উপস্থিত সবাইকে অনুপ্রাণিত করে।

শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রায় অংশগ্রহণের আনন্দ সকলের সামনে তুলে ধরেন লেখক ও গবেষক ড. মোহাম্মদ জাফর ইকবাল।

পাবনা পদযাত্রার অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন উত্তর মেরু অভিযাত্রী এবং পাখি বিশেষজ্ঞ ইনাম আল হক। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই পদযাত্রার কলেবর বাড়তে বাড়তে একদিন তা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। এ সময় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন।

মৌলভীবাজার পদযাত্রার অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন মাধুরী মজুমদার। তিনি আশাবাদ ব্যাক্ত করেন সামনে এই পদযাত্রা মৌলভীবাজারে আরও বিস্তৃত হবে।

ব্রতচারী সংঘের বন্ধুরা পরিবেশন করে ব্রতচারী নৃত্য যা উপস্থিত পদযাত্রী বন্ধুদের অনুপ্রাণিত করে।

এবছর শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রায় সোহাগ স্বপ্নধারা এবং ভারতেশ্বরী হোমস-এর শিক্ষার্থীরা পুরো পথ হেঁটে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। ভারতেশ্বরী হোমসের অংশগ্রহণ এবং তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন হেনা সুলতানা এবং সোহাগ স্বপ্নধারা স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাগরিকা দাস তাদের এই পদযাত্রায় যুক্ত হবার গল্প শোনান। সোহাগ স্বপ্নধারার শিক্ষার্থীদের পরিবেশনা এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অডিও ভিজ্যুয়াল টিমের নির্মিত ডকুমেন্টারি উপস্থিত সকলের মনে পদযাত্রার দিনের স্মৃতি ভেসে ওঠে।

অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিযাত্রী সংগঠক নিশাত মজুমদার, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক জিএম এস এম মহাসিন হোসেন এবং শাহজালাল ইসলামি ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইমাম হোসেন গাজী।

সনদপত্র প্রদান এবং ফটো সেশনের পর ব্যান্ড দল 'আপনঘর' সঙ্গীত পরিবেশন করে।

ইমাম হোসেন
অভিযাত্রী

১০ম আন্তর্জাতিক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব পুনর্মিলনী

১৭ মে ২০২২। দিনটি অন্য সব দিনের মতো ছিলো না, মনে হচ্ছিলো আজ একটা মিলনমেলা হবে। তবে বর্ষাস্নাত মিলনমেলা যে এতোটা মুখরিত এবং প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর থাকবে, সে আশা সম্ভবত ক্ষীণ ছিলো। সেই আশঙ্কার মুখে ছাই দিয়ে আবারও সবাই উপস্থিত হলেন তাদের প্রাণের জায়গায়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে '১০ম আন্তর্জাতিক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব পুনর্মিলনী' জাদুঘরের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে গত ১১-১৫ মার্চ পর্যন্ত আয়োজিত 'Liberation DocFest'-এর দশম আসরে অংশগ্রহণ করা ভলান্টিয়ারদের সনদপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ফেস্টের ভলান্টিয়াররা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের বরেণ্য কবি নির্মলেন্দু গুণ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, চলচ্চিত্র নির্মাতা এনায়েত করিম বাবুল, লিবারেশন ডকফেস্টের পরিচালক তারেক আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শরীফুল ইসলাম শাওন।

আষাঢ় মাসের সেই সন্ধ্যাটা যেনো তারুণ্যের শক্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছিলো। আয়োজন শুরু হয় প্রামাণ্যচিত্র 'বুড়ীগঙ্গা ৭১' প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। নির্মাতা এনায়েত করিম বাবুল তরুণদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেওয়ার সময় নস্টালজিক হয়ে পড়েন। তিনি অনেক বছর পরে দেশে ফিরে মাত্র একজন সহযোগী নিয়ে কীভাবে প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণ করেন, কীভাবে এতো বছর পর গ্রামের মানুষেরা তার সাথে কথা বলতে আগ্রহী হলো- সেই গল্পগুলোই তরুণদের কাছে তুলে ধরেন। সেইসাথে তরুণদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের কথা শোনার জন্যও অনুরোধ জানান।

তরুণরাও ডকফেস্টে কাজ করার অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তারা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আরো জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ভবিষ্যতেও তারা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে কাজ করবেন। সবার চোখেমুখে যেনো আনন্দের অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছিলো তখন।

পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, লিবারেশন ডকফেস্টের পরিচালক তারেক আহমেদ এবং কবি নির্মলেন্দু গুণ। সবাই জাদুঘরকে নিয়ে কথা বলার সময় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। এছাড়াও কীভাবে ছোট একটা গন্ডির মাঝ থেকে জাদুঘরটি আজ এতো বৃহৎ পরিসরে দাঁড়িয়ে আছে সেই স্মৃতি রোমন্থন করেন। ভবিষ্যতে যেনো জাদুঘরের কর্মযজ্ঞ আরো বৃহৎ পরিসরে পৌঁছায় সেই কামনা করেন।

এরপর শুরু হয় সনদপত্র প্রদান। মঞ্চে নাম ঘোষণা শুরু হলে ভলান্টিয়াররা একে একে তাদের সনদপত্র গ্রহণ করে। প্রত্যেকের মুখে ছিলো বিজয়ের হাসি। সনদপত্র প্রদান শেষে সবাই ক্যাফেটেরিয়ায় হালকা নাস্তা খেতে খেতে আড্ডায় মেতে ওঠে।

ডকফেস্টের দুজন ভলান্টিয়ারের ছিলো সেদিন জন্মদিন। তারা যমজ বোন- ওহী আর রাহী। তাদের জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা হয়। কেক কেটে সবাই মিলে জন্মদিন উৎসব পালন করে। একই দিনে জন্মদিন এবং পুনর্মিলনী-এই দুই উৎসব যেনো নিয়ে এসেছিলো দ্বিগুণ আনন্দ।

সবাই একটা কথা বারবার বলতে থাকে, আবার কখন দেখা হয় কে জানে, আবার সবার সাথে অবশ্যই যোগাযোগ থাকবে এই কথা বলে একে অপরকে সান্ত্বনা দেয়। আর আগামী বছর আবার ডকফেস্টে কাজ করার সুযোগ থাকবে, এই আশা মনে নিয়ে সবাই বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে।

এই ঝুম বৃষ্টিতে সেজেগুজে জাদুঘরে চলে আসতে পারতাম না, যদি জাদুঘরটা নিজের আপন জায়গায় পরিণত না হতো। আমার মতো আরো অনেকের কাছেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভালোবাসার নিজস্ব জায়গা। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়, শক্তি দেয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য শুভকামনা।

লামিয়া আফরোজ রিহা
ভলান্টিয়ার, ১০ম লিবারেশন ডক ফেস্ট

ADAM JONES রচিত SITES OF GENOCIDE গ্রন্থে বাংলাদেশ গণহত্যা প্রসঙ্গ

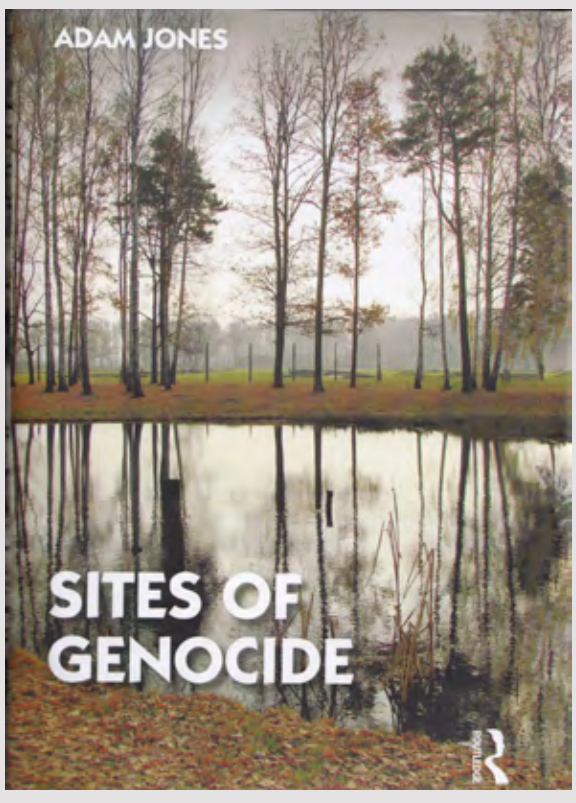

কানাডার বৃটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক এ্যাডাম জোনস বিশ্বনন্দিত গণহত্যা বিশ্লেষক। গণহত্যা অধ্যায়নের ক্ষেত্রে তার রচিত গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হিসেবে বিবেচিত। তার রচিত গ্রন্থতালিকার সর্বশেষ সংযোজন সদ্য প্রকাশিত SITES Of GENOCIDE গ্রন্থটি। ১৮টি প্রবন্ধের সংকলন এই গ্রন্থ। প্রবন্ধসমূহকে দুটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে, যার প্রথম পর্বে স্থান পেয়েছে The Bangladesh Genocide in Comparative Perspective অধ্যায়। তিনি তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্য দিয়ে একাত্তরের পূর্বে বিশ্বে সংঘটিত গণহত্যার পেছনে জাতিগত, গোষ্ঠীগত এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ যেভাবে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে একাত্তরে বাংলাদেশে যে নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ তার পেছনে সমান অনুঘটক কাজ করেছে বলে তুলে ধরেছেন। পাশাপশি গণহত্যা অধ্যায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গণহত্যা বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিদ্বজ্জনের চর্চা যে কম সেটিও স্বীকার করে নিয়েছেন। অনন্দের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে এ্যাডাম জোনসের প্রবন্ধটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৫ সালে। বাংলাদেশের গণহত্যা বিষয়ে তার গবেষণার নেপথ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিশেষত ট্রাস্টি মফিদুল হকের অবদানের কথা ধন্যবাদের সাথে স্মরণ করেছেন। আমরা আশা করি আন্তর্জাতিক প্রকাশনায় একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞকে গণহত্যা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক গণহত্যার স্বীকৃতি লাভে সহায়ক হবে।

জামালপুর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

সংরক্ষণ করা, বাহাদুরাবাদ ঘাটকে বধ্যভূমির মর্যাদা দেওয়া, বাহাদুরাবাদে যমুনা নদীতে পাকিস্তানি বাহিনীর ডুবে যাওয়া জাহাজ (যা বর্তমানে বালির নিচে চাপা পড়ে আছে) উদ্ধার করে জাদুঘরে সংযোজন করা ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন মুক্তিযোদ্ধারা।

দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন আশেক মাহমুদ কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব শফিকুল ইসলাম আকন্দ, আশেক মাহমুদ কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ জনাব হারুন অর রশিদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব মাহফুজ আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোকলেছুর রহমান, জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও অ্যাডভোকেট বাকী বিল্লাহ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের চিন্তা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে আপনাদের ভাবনা এ জাদুঘর নির্মাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আপনারাই হবেন এ জাদুঘরের রক্ষক ও প্রহরী। জাদুঘরে ইতিহাস উপস্থাপনের কাজে কোন ভুল ঘটলে সেটিও আপনারা ধরিয়ে দেবেন। তিনি জাদুঘর স্থাপনে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মারক প্রদানের আহ্বান জানান। সভাপতি জামালপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ফারুক আহাম্মেদ চৌধুরীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মতবিনিময় সভা সমাপ্ত হয়। সভা শেষে মির্জা আজম এমপি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিনিধিদলকে নিয়ে শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী ও জামালপুর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন।

১৭ তম মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

জুরি হিসেবে অভিজ্ঞতা

মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আমার যোগদান অনেকটা আকস্মিক বলা চলে। এই উৎসবের সাথে বাংলাদেশের একটা দীর্ঘ সম্পর্ক রয়েছে। এর আগে ২০১৬ সালে বাংলাদেশের নির্মাতা কামার আহমেদ সায়মনের ছবি 'শুনতে কি পাও' ভারতের এই বৃহৎ স্বল্পদৈর্ঘ ও প্রামাণ্যচিত্র উৎসবে সেরা ছবির পুরস্কার অর্জন করেছিল। তবে এই প্রামাণ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ চলচ্চিত্র উৎসবটির সাথে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রামোদিদের যোগাযোগ উৎসবটির শুরু থেকেই। ১৯৯০ সালে ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থা-ফিল্মস ডিভিশনের উদ্যোগে দ্বিবার্ষিক এই চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়। সে বছর বাংলাদেশ থেকে দুই সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিল।

বাংলাদেশ যে এবার এই উৎসবের থিম কান্ট্রি হতে যাচ্ছে, সে খবর আগেই জানা ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বন্ধুরাষ্ট্র ভারত যে কোন আয়োজনে বাংলাদেশকে বিশেষ গুরুত্ব দেবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে একটা চলচ্চিত্র উৎসবে থিম কান্ট্রি হবার সৌভাগ্য এবারই প্রথম বলা চলে। থিম কান্ট্রি হিসেবে এ বছর বাংলাদেশের ১১টি প্রামাণ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এই উৎসবে প্রদর্শিত হয়। অন্যান্য ছবির পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রযোজিত তিনটি প্রামাণ্যচিত্রও এই উৎসবে স্থান পায়।

উৎসবের মূল আয়োজন ছিল ২৯ মে থেকে ৪ জুন। তবে উৎসবের জুরি হিসেবে আয়োজক ফিল্মস ডিভিশন আমাকে ২৫ মে উৎসব কেন্দ্র মুম্বাইয়ের ফিল্মস ডিভিশনে উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ জানায়। উৎসবের প্রতিযোগিতা বিভাগের ছবিগুলো আগেভাগেই যাতে দেখে নেয়া যায়, সেই লক্ষ্যেই ছিল এই পূর্ব আমন্ত্রণ।

এবার মুম্বাই সফরে দুটো অনন্য অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। প্রথমটি ন্যশনাল মিউজিয়াম অব ইন্ডিয়ান সিনেমা নামে ভারতীয় সিনেমার এক অনন্য জাদুঘর দর্শন। ফিল্মস ডিভিশনের মুম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় অফিস প্রাঙ্গণেই এই জাদুঘরের অবস্থান। জাদুঘরে কালের বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ভারতের সিনেমাকে বিভিন্ন গ্যালারিতে ভাগ করা হয়েছে। এখানে ঠাঁই পেয়েছে ভারতীয় শৈল্পিক সিনেমার সবচেয়ে সেরা প্রতিভা, আবার কখনোবা মূলধারার বাণিজ্যিক সিনেমার নানা আইকনিক ছবি, নায়ক-নায়িকা বা প্রপ্স, কস্টিউম ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গ্যালারিগুলো।

ন্যশনাল মিউজিয়াম অব ইন্ডিয়ান সিনেমার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমার যিনি দিকপাল-সেই সত্যজিৎ রায় প্যাভিলিয়ন। জাদুঘরের নতুন ভবনে প্রবেশ করতেই দেখা মিললো রায় মহাশয়ের। মাদাম তুঁসো'র মিউজিয়ামের আদলে গড়া তার এই প্রতিমূর্তি যে কাউকে প্রথমেই চমকে দেবে। সেই সাড়ে ছ'ফুট উচ্চতার মানুষটি ক্যামেরায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বেইসমেন্টের একটা অংশ জুড়ে এই সত্যজিৎ রায় প্যাভিলিয়ন, নীচতলার একপাশেও যার আংশিক ডিসপ্লে চলমান সবসময়। তার অসাধারণ সব সিনেমার ক্লিপ, পোস্টার, স্টোরি বোর্ড, স্ক্রিপ্ট, নিমাই ঘোষ বা আমাদের সাইদা খানমের তোলা তার আলোকচিত্র বা বিভিন্ন চলচ্চিত্রের স্থির চিত্র এমনকি তার ফেলুদা আর প্রফেসর শঙ্কুকেও খুঁজে পাবেন যে কেউ এই প্রদর্শনীতে। এককথায় এই প্রদর্শনী অনন্য এক অভিজ্ঞতা যে কোন সিনেমাপ্রেমির জন্য।

অনেকটা উল্টো চিত্র নজরে এলো, যেদিন আমরা রাজকমল স্টুডিও ও তার কর্ণধার মারাঠি তথা ভারতীয় সিনেমার প্রথম পর্বের আরেক আইকন ভি শান্তারামের সংগ্রহশালা দেখতে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। প্রখ্যাত সিনে সাংবাদিক ও লেখক-গবেষক সঞ্জিৎ নারোয়েকার প্রায় দু'দশকের চেষ্টায় এই স্টুডিওতেই ভারতীয় সিনেমার বই ও ম্যাগাজিনের এক অনবদ্য সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছেন-যা ভি শান্তারাম ট্রাস্টের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে। এ সবই তালাবন্দি হয়ে পড়ে আছে, আর উইপোকাদের খোরাক হচ্ছে। তা প্রদর্শন বা ডিসপ্লের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা যেমন নেই, তেমনি নেই উপযুক্ত কোন পাঠক-গবেষক।

তবে মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আমার যোগ দেয়ার এই মিশন অসম্পূর্ণ থেকে যেত, যদি না আমি পুরুশ বাওকার নামে ইতিহাসের সাক্ষী এক মানুষের সাক্ষাৎ পেতাম। বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে অনেক বিদেশিকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী হিসেবে নানা সম্মাননা ও পদক তুলে দিয়েছেন। পুরুশ বাওকার কি করে সেই তালিকা থেকে বাদ পড়লেন, জানি না।

তার সাথে যোগাযোগটি আকস্মিক হলেও বলা চলে উৎসব আয়োজক ফিল্মস ডিভিশন কর্তৃপক্ষ তাকে সম্মাননা জানাবে, এটি তাদের পরিকল্পনাতেই ছিল। একাত্তরের ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে পুরুশ বাওকার তাতে প্রাসঙ্গিকভাবেই যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

উৎসবের চতুর্থ দিন বিকেলে তার সাথে দেখা হলো। আগেই জেনেছিলাম, ফিল্মস ডিভিশনের পুরানো ভবনের নয়তলায় রি-রেকর্ডিং স্টুডিও যেখানে, সেই তলাতেই একটা অডিটরিয়ামে বাংলাদেশের ছবি দেখানো হবে। ছবি শুরুর পূর্বে পুরুশ বাওকারকে সম্মাননা জানানো হলো। ছোট এই সম্মাননা পর্ব শুরু হতেই তিনি যেন স্মৃতির ঝাঁপি মেলে ধরলেন। তাঁর কথা শোনার আগ্রহ তাঁর স্বদেশি ভারতীয় বন্ধুদের না থাকলেও আমাদের কাছে তার গুরুত্ব অনেক। তাই আনুষ্ঠানিকতা শেষে তার সাক্ষাৎকার চাইলাম। রাজী হয়ে গেলেন, জানালেন, বাংলাদেশ নিয়ে তার স্মৃতি পুরো একাত্তর সাল জুড়েই।

মুম্বাই চলচ্চিত্র উৎসবের পাশাপাশি এবছর মুম্বাই যাওয়ার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, ফিল্মস ডিভিশনের আর্কাইভে রক্ষিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ফুটেজ সংগ্রহের চেষ্টা চালানো। পুরুশ বাওকারের সাথে আলাপের পর সে কাজে আরো জোরদার চেষ্টা চালাই। তবে আশাহত হতে হয়। কারণ, ফিল্মস ডিভিশনের এই মহামূল্যবান ফুটেজ বিনে পয়সায় পাওয়ার সুযোগ কোনভাবে নেই। ফিল্মস ডিভিশন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে 'নাইন মান্থস টু ফ্রিডম' এবং বঙ্গবন্ধুর উপর তাদের নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র দুটো এযাত্রায় দিতে রাজি, যা দ্রুত সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে।

একটা ব্যক্তিগত বেদনার কথা বলে এই লেখা শেষ করবো। ফিল্মস ডিভিশনের নামটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িয়ে আছে। যতদূর জানি, তারেক মাসুদ তার 'মুক্তির গান' নামের অসাধারণ ছবিটির জন্য এই ফিল্মস ডিভিশনের আর্কাইভাল ফুটেজ কাজে লাগিয়েছিলেন। আর শুকদেবের ছবি 'নাইন মান্থস টু ফ্রিডম' তো ফিল্মস ডিভিশনেরই প্রযোজনা। কেবল একাত্তর নয়, ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থা ফিল্মস ডিভিশনের আর্কাইভে ১৯৪০ সাল থেকে সংগৃহীত ফিল্ম ফুটেজ সংরক্ষিত আছে। সম্প্রতি ভারত সরকারের এক সিদ্ধান্তের কারণে এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হতে চলেছে। কেবল ফিল্মস ডিভিশনই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের কারণে ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ অব ইন্ডিয়া, কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর সার্টিফিকেশন বোর্ড, শিশু চলচ্চিত্র সংসদ- এই প্রতিষ্ঠানগুলোও বন্ধ হতে চলেছে। ফলে, ফিল্মস ডিভিশনের সংগ্রহে থাকা বিশেষতঃ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং '৪৭-এর দেশভাগ নিয়ে সংগৃহীত ফুটেজ অবিলম্বে সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়ার সময় এসেছে। যতদুর জানি, ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানগুলো অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে। তারপর, ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের কারণেই সবক'টি প্রতিষ্ঠানের আত্তীকরণ ঘটবে আরেক সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সাথে। তার আগেই মুক্তিযুদ্ধের অমূল্য সব ফিল্ম ফুটেজ সংগ্রহে বাংলাদেশ থেকে উদ্যোগ নিতে হবে। নয়তো কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে '৭১-এর সব অমূল্য দলিল।

তারেক আহমেদ

'আঁরা রোহিঙ্গা' শীর্ষক প্রদর্শনী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি প্রদর্শনী আয়োজকদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান এবং মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য সরকার, এনজিও, অংশীদার, জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গসংস্থাকেও ধন্যবাদ জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হাসান সারওয়ার। তিনি বলেন, 'প্রদর্শনী দেখার সময় আমরা মিয়ানমারের নাগরিকদের সংস্কৃতি, পরিচয়, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট দেখতে পাব। পঞ্চাশটি ছবির প্রদর্শনী হয়তো সেই সমস্ত মানুষের যন্ত্রণা ও বেদনাকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে না কিন্তু তা বিশ্ব সম্প্রদায়ের হৃদয়ে সচেতনতা ও সহানুভূতি জাগাতে সাহায্য করবে। প্রদর্শনীতে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয়া বাংলাদেশী শরণার্থীদের জীবনকথাও দেখতে পাই। আমরা আশা করি এই ধরনের প্রদর্শনী ও উদ্যোগ বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আর্কষণ করবে এবং জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মর্যাদাপূর্ণ ও স্থায়ী প্রত্যাবর্তনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে'।

১৯৭১ সালের শরণার্থী অঞ্জলি বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হওয়া বাঙালি শরণার্থীদের যন্ত্রণার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন 'মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম মানবতা এবং বাংলাদেশ এখন মানবতার প্রতি দায়িত্ব পালন করছে। এই প্রদর্শনীর ৫০টি ছবি পঞ্চাশ বছর আগের সেই সময়কে ফিরিয়ে এনেছে যখন আমি শরণার্থী ছিলাম'।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বিশ্ব শরণার্থী দিবস পালনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতি বছর এই দিবসটি পালন করে। তিনি ডেভিড পালাজন এবং রোহিঙ্গাটোগ্রাফার ম্যাগাজিনকে ধন্যবাদ জানান। এই ম্যাগাজিন রোহিঙ্গা যুবকদের ফটোগ্রাফির মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রা তুলে ধরতে উৎসাহিত করেছে'। মফিদুল হক প্রদর্শনীটি অন্যান্য স্থানে এবং বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন এবং আশা করেন যে ইউএনএইচসিআর এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও এই উদ্যোগে যুক্ত হবে। তিনি বলেন, 'এটি আশাহীন মানুষকে আশা দেওয়ার একটি প্রক্রিয়া, কণ্ঠহীন মানুষকে কণ্ঠ দেওয়ার প্রক্রিয়া এবং এটিই গুরুত্বপূর্ণ কাজ যাতে আমরা সবাই নিয়োজিত'। তিন সপ্তাহব্যাপী আয়োজিত এ প্রদর্শনীর সমাপ্তি ঘটে গত ৭ জুলাই।

আর্কাইভ ও ডিসপ্লে বিভাগ

বাংলাদেশের জন্ম এবং একজন অভিজিৎ দাশগুপ্ত

বাংলাদেশ পা দিয়েছে ৫১ বছরে। এই একান্ন বছর ধরে বিশ্বের নানা প্রান্তের কত মানুষ তাদের স্মৃতিতে বয়ে নিয়ে চলেছেন বাংলাদেশের জন্মকথা। কত মানুষের কতরকম সম্পৃক্ততা। আর সেই মানুষটির নাড়ির টান যদি থাকে এদেশের মাটিতে, তবে সেই স্মৃতি তিনি অমূল্য সম্পদ জ্ঞানে সংরক্ষণ করেন। ওপার বাংলার চিত্র-সাংবাদিক, লেখক, টিভি ব্যক্তিত্ব অভিজিৎ দাশগুপ্ত তেমনই একজন মানুষ। জন্মসূত্রে ঢাকা তার স্মৃতিতে রয়েছে আশৈশব। ঢাকার ওয়ারিতে ছিল ঠাকুরদাদার বসবাস, বাবা ফুটবল খেলতেন ওয়ারি ক্লাবের হয়ে, জ্যাঠা ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের চীফ হেল্‌থ অফিসার। বাংলাদেশের সাথে তাদের সবার যে আত্মার সম্পর্ক তা সঞ্চারিত হয় তার মনে। তার বড় ভাই তৎকালীন ব্রিগেড মেজর অশোক দাশগুপ্ত ছিলেন পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষক। ফলে ২৫ মার্চ ঢাকায় অপারেশন সার্চলাইট শুরু হবার খবরে কলকাতার তরুণ চিত্রসাংবাদিক অভিজিৎ বিচলিত হবেন সেটাই স্বাভাবিক। কেবল বিচলিত হয়েই দায়িত্ব শেষ করেন নি, প্রথম সুযোগে ২৮ মার্চ যশোর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন তিনি, তার বর্ণনায়, 'পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে প্রায় এক ঘন্টা হাঁটার পর চোখে পড়ল- প্রথম বাংলাদেশী পতাকা।... আমার ছবি তোলা শুরু হলো পাকিস্তানি সেনাদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঠিক পরেই। ২৫ মার্চের রাতের পর জগন্নাথ হলের ভয়াবহ গুলিচালনার প্রথম ছবি হিসেবে আমার তোলা ছবিগুলোই প্রকাশিত হয়।' এভাবে একাধিকবার সীমান্ত পার হয়ে এসে ছবি তুলেছেন তিনি। তখন তিনি যুক্ত ছিলেন প্যারিসের বৃহত্তম ফটো এজেন্সি 'গামা প্রেস ইমেজেস'-এর সাথে। এই সংস্থার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন পত্রিকায় তার ছবি বাংলাদেশের কথা বলেছে। এরপর বাহাত্তরের ৫ জানুয়ারি এসেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশে। সদ্য স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধুর পরিবার, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ-এর পরিবারসহ তুলেছেন অনেক ছবি। এমনকি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের বিধ্বস্ত কক্ষের ছবিও তিনি তুলেছেন।

গত ৭ জুলাই তিনি এসেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। পরিদর্শন শেষে তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের এবং ট্রাস্টি সারওয়ার আলীর সাথে আলাপে যুক্ত হন। এসময়ে তিনি জাদুঘর প্রদর্শনীর প্রশংসা করেন এবং তার তোলা আলোকচিত্রের মূল কপি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রদান করবেন বলে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি বাংলাদেশ গণহত্যার ৫০ বছর উপলক্ষে তার তোলা ছবির সংকলন 'আমার চোখে বাংলাদেশের জন্ম' নামে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি গ্রন্থটি ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের এবং ট্রাস্টি সারওয়ার আলীর হাতে তুলে দেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টারকে তিনি তার একাত্তরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং তা ধারণ করা হয়। এমন আরো অনেকের অভিজ্ঞতা যুক্ত হবে জাদুঘরে এটাই কাম্য।

প্রকাশিত হলো
4th International Conference on Bangladesh Genocide and Justice- এর Proceedings

২০১৫ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস-এর উদ্যোগে চতুর্থবারের মতো বাংলাদেশের গণহত্যা এবং ন্যায়বিচার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১৭ জন বিদ্বজ্জন যারা গণহত্যা অধ্যয়নে যুক্ত, তাদের সাথে জাতীয় পর্যায়ের খ্যতিমান গবেষক ও বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনদিনের সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে বিদ্বজ্জনেরা গণহত্যা, ন্যায়বিচারসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তাদের প্রবন্ধসমূহ সংকলিত করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সম্প্রতি প্রকাশ করলো। গ্রন্থটি সংগ্রহের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে যোগাযোগ করুন।

মুক্তিযুদ্ধের চিকিৎসা ইতিহাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নিয়ে গবেষণা করা একান্ত প্রয়োজন। ডা. খায়রুল ইসলাম তার আলোচনায় বলেন, একাত্তর সালের মার্চ মাসের শেষে ভারতে অবস্থিত ইউএনএইচ-সিআর-এর প্রতিনিধি সদর দপ্তরকে শরণার্থীদের ব্যাপারে অবগত করেন। অন্যদিকে জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেন সেক্রেটারি জেনারেল মি. উথান্টের সাথে দেখা করেন। ১৬ এপ্রিল ১৯৭১ প্রথমবারের মতো কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় শরণার্থী বিষয়ক সংবাদে বলা হয়, ইতিমধ্যে ৩০ হাজারের অধিক মানুষ বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং শীঘ্রই তা মিলিয়ন ছাড়াবে। ২৭ এপ্রিল ভারত সরকার ইউএনএইচসিআর-কে এব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে অবগত করে। এরপর মি. উথান ইউএনএইচসিআর মিশনের হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানকে বাংলাদেশের শরণার্থী বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করেন। ৫ মে তারিখ নাগাদ মিশনে লোকজন ভারতে পৌঁছান এবং যুদ্ধের ব্যাপকতা আঁচ করতে না পেরে ৬ মাসে ২০ লক্ষ শরণার্থীর জন্য ১৭৫ মিলিয়ন ডলারের বাজেট তৈরি করে। তাদের ধারনা ছিল ৩০ লাখ মানুষ আসবে, এর মধ্যে ১০ লাখ লোক আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে উঠবে। যদিও প্রকৃত ঘটনা আরও শোচনীয় ছিল। আমি বাংলাদেশের গবেষকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই– এই যে ডিসেম্বর নাগাদ এক কোটি শরণার্থীর কথা বলা হয়, এটা কিন্তু ভারত সরকার দেয়া তথ্য নয়। এটা মূলত ১৯৭২ সালের ১১ আগস্ট তারিখে প্রদত্ত জাতিসংঘের দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। আমি আরও একটা ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে– তৎকালীন ভারতবর্ষের যেসকল জায়গায় শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছে সেসব জায়গার স্থানীয় জনসংখ্যার তুলনায় শরণার্থীদের জ্যামিতিক বিস্ফোরণের বিষয়ে। এমতাবস্থায় শরণার্থীদের থাকার জায়গা, পয়োঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, খাওয়ার পানির কথা চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন কলেরা কীভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। ভারতীয় সরকারের যথাযথ উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও বাস্তবতার কারণে অনেক মানুষ বিশেষ করে শিশুরা মারা যেতে থাকলো। তখনকার স্যালাইন ছিল কাচের বোতলজাত। ফলে ক্যাম্পের মতো উন্মুক্ত জায়গায় একজন রোগিকে ৪/৫ বোতল স্যালাইন দেয়া খুব দুরূহ ব্যাপার ছিল। জুলাই মাস নাগাদ ৩ লক্ষ ১৭ হাজার মানুষ কেবল কলেরায় মারা গেলো। ভারত সরকার বিজ্ঞানি দিলীপ মহলানবীশকে বিদেশ থেকে ডেকে আনলো। তিনি ১৯৬৮ সালে বাংলাদেশের আইসিডিডিআরবি আবিষ্কৃত ওআরএস ড্রামে ড্রামে গুলিয়ে শরণার্থী শিবিরগুলোতে সরবরাহ করার উদ্যোগ নিলেন। প্রথম দিকে ডাক্তাররা পর্যন্ত ওআরএস-এর ওপর আস্থা রাখতে পারেননি। কিন্তু পরে দেখা গেলো লবণ-পানির ওআরএস ব্যাপক কাজে দিচ্ছে।

আলোচনার উপসংহারে গবেষক ডা. খায়রুল ইসলাম জানান– ১. শুধু কলেরায় নয় শরণার্থী শিবিরগুলোতে নানাভাবে অগনিত মানুষের মৃত্যু হয়েছে, যার হিসাব একাত্তরের ৩০ লক্ষ শহিদের বাইরে থেকে গেছে। ২. ভারত সরকার এবং বিশ্ববাসীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একাত্তরের জুলাই মাসের মধ্যে কলেরা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। ৩. বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে ব্যবহৃত ওআরএস পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক ভূমিকা রাখে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদঘরে স্মারক প্রদান করার আগে সাংবাদিক শিশির মোড়ল বলেন– ১৯৭১ সালের জৈষ্ঠ্য মাসের ৪ তারিখ আমার পরিবারের ১৩জন সদস্য খুলনা জেলার দাকোপ ইউনিয়নের সাহেবাবাদ গ্রাম থেকে নদীপথে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা করে। ৭ তারিখ আমরা ভারতের হাসনাবাদ পৌঁছাই। মে মাসের সে সময়টাতে ভারতে গিয়ে আমাদের পরিবারের আমিসহ তিনজন কলেরায় আক্রান্ত হই। আমার জেঠাতো ভাই বিভাস এসময় কলেরায় মারা যায়। আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় টাকি হাসপাতালে। সেখানে তিন দিনে চার বোতল স্যালাইন আমাকে দেয়া হয়। সুস্থ হয়ে আমার মায়ের সাথে আমি বারাসাত, নিউ ব্যারাকপুর, রানাঘাট এবং শেষ পর্যন্ত চাঁদপাড়া শরণার্থী ক্যাম্পে থাকি। এতো টানাটানির মধ্যেও আমার মা চার বোতল কলেরা স্যালাইনের একটি বোতল কেন জানি রেখে দিলেন। স্বাধীনতার পর আমাদের বাড়ি দুবার বদল হয়। একবার নদী ভাঙ্গার ফলে, আরেকবার সম্পত্তি ভাগাভাগির কারণে। কিন্তু আমার মা একাত্তরের স্মৃতি বিজড়িত এই বোতলটি হাত ছাড়া করেননি। আজ আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এই দূর্লভ স্মৃতি-স্মারকটি হস্তান্তর করতে পেরে আনন্দিত ও নির্ভার।

সবশেষে সমাপনী বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের বলেন, একাত্তরের এই কলেরা স্যালাইনের বোতল মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পরে এসে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা কতো বহুমাত্রিক ছিল। মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক এমন অগণিত মূল্যবান স্মারক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যথাযথ গুরুত্বের সাথে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে চলেছে। দেশবাসীর কাছে আমাদের আহ্বান– বরাবরের মতো সবার ভালোবাসার হাত যেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দিকে বাড়িয়ে দেন।

শরীফ রেজা মাহমুদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

২২ জুন ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সভাপতি ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে ইতিহাস বিভাগের প্রথম বর্ষের ১১০ জন শিক্ষার্থী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী শুরুতে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করেন। শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র দেখে, জাদুঘর পরিদর্শন করে এবং সবশেষে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন। উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মিল্টন কুমার দেব এবং প্রভাষক সজীব কুমার বণিক ও ফাইরুজ জাহান। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন বলেন, ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থীরা তাদের অধ্যয়নের অংশ হিসেবে নিয়মিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করবে।

নীলফামারী জেলার কিছু স্মৃতিময় স্থান

উত্তর জনপদের প্রাচীন মহকুমা শহর নীলফামারী জেলায় তৃতীয় বারের মত মে, ২০২২-এ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। নবীন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের নিকট মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থান ও তথ্য সংগ্রহের কাজ করে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এবারের নীলফামারী জেলার স্থানীয়দের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুর নীলফামারী আগমন ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানের তথ্য জানা যায়। সংগৃহিত স্মৃতিময় স্থানের কিছু তথ্য-

(১) নীলকুঠি, (২) ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, (৩) বাকডোকরা বঙ্গবন্ধু স্মৃতিফলক, (৪) সিও অফিস হলুদ ভবন, (৫) ডাক বাংলো, (৬) নীলফামারী সরকারি কলেজ, (৭) গোলাহাট বধ্যভূমি, (৮) টেকনিক্যাল স্কুল (বাঁ থেকে ডানে)

নীলফামারী সরকারি কলেজ : এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানি বাহিনী নীলফামারী শহরে প্রবেশ করে এবং কলেজে ক্যাম্প স্থাপন করে। কলেজ ক্যাম্পাসটি ছিল সেনা অফিসারদের বাসস্থান ও নির্যাতন কেন্দ্র। নীলফামারী জেলার বৃহৎ বধ্যভূমিটিও এই কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থিত।

ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় : এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানি বাহিনী নীলফামারী শহর দখলে নেয়ার পর পার্শ্ববর্তী থানা শহরগুলোও দখল করে। ডোমার থানায় পাকিস্তানি বাহিনী প্রবেশ করে। ডোমার উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্যাম্প স্থাপন করে।

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি (লুৎফল হক) : ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলন শেষে আগস্ট মাসের প্রথম দিকে আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংগঠনকে উজ্জীবিত করতে সারাদেশ পরিভ্রমণ করেন। তখন সাবেক মন্ত্রী খয়রাত হোসেন-সহ বঙ্গবন্ধু ট্রেন যোগে সৈয়দপুর হয়ে ডোমার সফরে আসেন। সংগঠনের কাজ শেষ করে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ নেতা লুৎফল হকের বাড়িতে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। ১৯৫৭ সালে বঙ্গবন্ধু যে বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন বর্তমানে সেই বাড়িটি স্মৃতি হিসেবে ভাঙ্গা কিছু অংশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ডাক বাংলো : পাকিস্তানি বাহিনী সরকারি কলেজের পাশাপাশি এই ডাক বাংলো দখল নিয়ে ক্যাম্প স্থাপন করে। এদেশীয় দোসরদের সহায়তায় তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে নিরীহ লোকদের ধরে নিয়ে আসতো এবং নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হতো।

গোলাহাট বধ্যভূমি : মুক্তিযুদ্ধে সৈয়দপুরে একটি জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয় যা ট্রেন গণহত্যা নামে পরিচিত। সৈয়দপুরে বাঙালির চেয়ে বিহারীর বসবাস বেশি হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই পাকিস্তানি বাহিনীকে তারা নানাভাবে সহযোগিতা করতো। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ১৩ জুন ১৯৭১ সকাল বেলা বিহারিরা বাঙালি মুসলিম ও হিন্দু মাড়োয়ারিদেরকে ভারতের হলদিবাড়ি পৌঁছে দেয়ার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সৈয়দপুর স্টেশনে দাড়িয়ে থাকা ট্রেনে উঠানো হয়। ট্রেনের প্রথম দুই বগিতে পুরুষ এবং অন্য দুই বগিতে নারীদের তোলা হয়। সকাল আটটার দিকে ট্রেনটি সৈয়দপুর স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে আসার পর গোলাহাট নামক স্থানে ট্রেনটি থামার সাথে সাথে সবাই অজানা আতঙ্কে আঁতকে উঠে। ঠিক তখনই পাকিস্তানি বাহিনী নিরিহ লোকদের উপর শারীরিক নির্যাতন করতে থাকে আর ট্রেন থেকে নেমে যেতে বলে। গোলাহাটে আগে থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা প্রস্তুত ছিল। নিরীহ লোকজন ট্রেন থেকে নামার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যরা ছুরি দিয়ে এবং গুলি চালিয়ে হত্যা করতে থাকে। অনেকে ট্রেনের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালাতে সমর্থ হয়েছিল। এভাবে ১৩ জুন গোলাহাট হত্যাকাণ্ডে ২১ জন বেঁচে যায়। তার মধ্যে শ্যামসুন্দর, বিনোদ কুমার ও তপন কুমার দাশ সৈয়দপুরে বসবাস করছেন বাকীরা ভারতে চলে গেছেন। ১৩ জুনের হত্যাকাণ্ডে প্রায় চারশতাধিক লোককে হত্যা করে তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন সৈয়দপুরের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ও ব্যবসায়ী। গোলাহাট বধ্যভূমিতে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার শহিদদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভের পাশে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার কয়েকজনের নাম লিপিবদ্ধ আছে।

বাকডোকরা বঙ্গবন্ধু স্মৃতি ফলক : ১৯৭০ সালের ২৩ অক্টোবর নৌকা প্রতীক প্রার্থী মো. আব্দুর রউফ-এর নির্বাচনী প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু নীলফামারী হয়ে ডোমার আসেন। ডোমার ডাক বাংলো মাঠে নির্বাচনী প্রচারণা শেষে মো. আব্দুর রউফ-এর অনুরোধে তার বাকডোকরার বাড়িতে আসেন, সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে সড়ক পথে দেবীগঞ্জ হয়ে পঞ্চগড় চলে যান। বাকডোকরায় যে স্থানে বঙ্গবন্ধু বসেছিলেন বর্তমানে সেখানে স্মৃতি ফলক নির্মাণ করা হয়েছে।

সিও অফিস হলুদ ঘর : ডোমার থানার সিও অফিস হলুদ দোতলা ভবনে পাকিস্তানি বাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করে। এছাড়া এই দোতলা ভবন ও গোবিন্দলাল আগারওয়ালার বাড়িটি ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র। পাকিস্তানি বাহিনী রাজাকারের সহায়তায় আশপাশের নিরীহ লোকদের ধরে এনে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে হলুদ ভবনের পাশে বনবিভাগের এলাকায় ফেলে রাখতো। বর্তমানে সিও অফিসটি উপজেলা সদর দপ্তর ও হলুদ ভবনগুলো পরিষদের কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবন।

টেকনিক্যাল স্কুল : পাকিস্তানি বাহিনী নীলফামারী জেলা দখলে নেয়ার পর সরকারি কলেজের পাশাপাশি ডাক বাংলো ও টেকনিক্যাল স্কুলে ক্যাম্প স্থাপন করে। পাকিস্তানি বাহিনী টেকনিক্যাল স্কুলটি নির্যাতন কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতো।

রঞ্জন কুমার সিংহ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর: ২৯ জুন ২০২২, বুধবার সকাল ১১টায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব রঞ্জিত কুমার দাস (অতিরিক্ত সচিব) এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব-এর পক্ষে ব্যবস্থাপক চন্দ্রজিৎ সিংহ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

নতুন ভাবনা নতুন প্রযুক্তি নতুন

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

জাদুঘরের ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর 'নতুন প্রযুক্তি, নতুন সম্ভাবনা' প্রসঙ্গে বলেন, আইসিটির গুরুত্ব বুঝতে পারি করোনাকালে সকলের কাছে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে পৌঁছাতে পেরে। শুধু শিক্ষার্থী নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমরা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে সকলের কাছে সহজে পৌঁছাতে পেরেছি। এর আরও গুরুত্ব হচ্ছে বিশ্বব্যাপী সংযোগ তৈরি হওয়ায়। সম্মিলনে ভিআর উপস্থাপন করেন 'ভার্চুয়াল মিউজিয়াম বাংলাদেশ'-এর আহমেদ জামান শহীদ। তিনি বলেন, এটা শিক্ষার কাজে লাগবে। ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ চিরস্থায়ী না কিন্তু ডিজিটাল টেকনোলজিতে এটা থেকে যাবে। চেষ্টা করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের উপকরণ দিয়ে ভিআর করা। শিক্ষক প্রতিনিধিরা বলেন, বধ্যভূমি তো শুধু ঢাকায় নয়, সারাদেশে এমন অনেক গল্প রয়েছে। ফলে ডিজিটাল কনটেন্টে বা ভিআর-এ এলাকার ইতিহাস যুক্ত করতে হবে।

তৃতীয় কার্যঅধিবেশনে শিক্ষার্থীদের নির্মিত এক মিনিটের মুক্তিযুদ্ধের ফিল্ম, বিভিন্ন ব্লগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যারা তুলে ধরেছে তার নমুনা এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা প্রসঙ্গে আলোচনা হয়।

শিক্ষক প্রতিনিধিরা তাদের মতামত এবং সুপারিশ পেশ করেন। সেগুলো পর্যালোচনা করে ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, এই মতামতগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং নতুন নতুন চিন্তাভাবনা চলে আসছে। মতামত অনুসারে ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণ করা হবে এবং ভাবতে হবে সেটা যেন উন্নত এবং সহায়ক হয়। জাদুঘরের ভূমিকা হবে উৎসাহমূলক, শিক্ষার্থীদের আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া।

সমাপনী বক্তব্যে ট্রাস্টি সারওয়ার আলী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শুরু হলে এর লক্ষ্য ছিল কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চার দেয়ালের বাইরে নিয়ে যাওয়া যায়। সেই কাজটাই করছেন নেটওয়ার্ক শিক্ষকরা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যে ডিজিটাল পাঠ উপকরণ বা ভিআর নির্মাণের নমুনা উপস্থাপন করছে এই কাজটা কিন্তু শিক্ষকদের– তারা এটাকে কীভাবে আরও আকর্ষণীয় করে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছাবেন! ফলে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন বাংলাদেশ যে স্বাধীন হল, তার যে চারটি মূল নীতি, এর সার কথা হচ্ছে ধর্মতত্ত্ব ও জাতিসত্তার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। ডিজিটাল কনটেন্ট হতে হবে এই ধারায়।

সত্যজিৎ রায় মজুমদার

নির্মিতব্য জামালপুর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

জামালপুর শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লীতে নির্মিত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এ জাদুঘর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন মির্জা আজম এমপি। ইতিমধ্যেই ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। জাদুঘরটির বাস্তবায়ন গ্যালারি বিন্যাস, তথ্যউপাত্ত, স্মারক সংগ্রহ ও গবেষণার কাজটি করছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ঢাকা।

গত ৫ জুলাই জামালপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় গ্যালারিতে জামালপুরের ইতিহাসের কি কি উপাদান স্থান পাবে তার একটি প্রাথমিক তথ্যচিত্র তুলে ধরা হয়।

তথ্যচিত্রে জাদুঘর গ্যালারি বিন্যাস, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা, ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে জামালপুরের তথ্য, স্মারক, আলোকচিত্রের সংযোজন দর্শণার্থীর মন অতি সহজেই কেড়ে নিবে। গ্যালারির উপস্থাপনায় আধুনিকতার পাশাপাশি পুরনোকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গ্যালারির প্রদর্শনী হবে আংশিক ডিজিটাল। ১৯৪৯ সালে বঙ্গবন্ধু জামালপুরে প্রথম এসেছিলেন। ঢাকার বাইরে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম রাজনৈতিক সভা হয়েছিলো জামালপুর শহরে। জামালপুর শহরে দুটি জায়গায় সভা-সমাবেশ হতো একটি শহরের বকুলতলার গোপাল দত্তের মাঠ (অভিনেতা আনোয়ার হোসেনের বাড়ি সংলগ্ন) আরেকটি হচ্ছে কংগ্রেস নেতা প্রকাশ দত্তের বাড়ি ও হায়দার আলী মল্লিক সাহেবের বাড়ির সামনে মাঠটিতে। গোপাল দত্তের মাঠে সভা সমাবেশ শুরু হয়েছিলো ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে আর প্রকাশ দত্তের মাঠে সভা-সমাবেশ শুরু হয়েছিলো বৃটিশ আমল থেকে। ধারনা করা হয় ১৯৪৯ সালে সভাটি প্রকাশ দত্তের বাড়ির সামনে মাঠটিতে হয়েছিলো। নেতাজী সুভাষ বোস জামালপুর এসেছিলো দুবার, প্রথমবার ১৯২৯ সালে দ্বিতীয়বার ১৯৩৮ সালে, দুবারই তিনি প্রকাশ দত্তের বাড়িতে উঠেছিলেন। সুভাষ বোসকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিলো আশু দত্তের বাবা প্রকাশ দত্তের বাড়ির সামনের মাঠেই। ইতিহাসের দিক থেকে জামালপুরের গৌরবের পাশাপাশি রয়েছে কলঙ্কের অধ্যায়। ১৯৭১-এর এপ্রিল মাসে বর্তমানে পলাতক যুদ্ধাপরাধী আলবদর নেতা আশরাফ হোসেনের নেতৃত্বে জামালপুরের মাটিতে প্রথম গঠিত হয়েছিল আলবদর বাহিনী। তারপর জামালপুর শহরের সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ ডিগ্রি হোস্টেল, সাধনা ঔষধালয়, হেমবাবুর গদিঘর, চাপাতলা ঘাট, শ্মশান ঘাট, ফৌতি গোরস্থানে আলবদর বাহিনীর নৃশংসতার কথা আমরা জানি। কামালপুর যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজ (বীর উত্তম)-সহ সর্বাধিক মুক্তিযোদ্ধা আর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় খেতাবে ভূষিত হয়েছেন ধানুয়া কামালপুর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য। হেলাল কোম্পানির দুই যোদ্ধা বশির আহমদ ও আনিসুল হক সঞ্জু ৪ ডিসেম্বর মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে ব্রিগেডিয়ার হারদ্বিপ সিং ক্লেয়ারের স্বাক্ষরিত আত্মসমর্পণের চিঠি নিয়ে ক্যাপ্টেন আহসান মালিকের কাছে যান এবং ধানুয়া কামালপুর মুক্ত হয়।

২০০৯ সালে ২৩ ডিসেম্বর মেলান্দহের কাপাসহাটিয়ায় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা নাসির সরকারের বাড়ির আঙ্গিনায় যে জাদুঘরটি সূচনা হয়েছিলো তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন মির্জা আজম এমপি। আর মুক্তিসংগ্রাম জাদুঘরটির নামকরণ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বর্তমান কাজের সাথে যুক্ত হয়েছে। জামালপুর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর হবে দেশের ইতিহাসের অন্যতম বাতিঘর। আর এ কাজে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একঝাক কর্মী দিন রাত শহর, গ্রাম-গঞ্জ থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের আরেকটি যুদ্ধ শুরু করেছে।

শহিদদের রক্তের ঋণ আমরা হয়তো কোন দিন শোধ করতে পারবো না, কিন্তু আগামী প্রজন্মকে ইতিহাস চর্চা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোকিত করার কাজটি আমাদের করতে হবে। এ কাজে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিকল্প নেই। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

হিল্লোল সরকার

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official